জাতীয় শিক্ষানীতি: সামাজিক প্রভাব

অপূর্বমোহন মুখোপাধ্যায়

সারা পৃথিবী যখন অতিমারীতে আক্রান্ত, প্রতিনিয়ত মৃত্যুর মিছিল যখন বেড়ে চলেছে সেই রকম পরিস্থিতিতে আমাদের দেশে আকস্মিকভাবে গত ২৯শে জুলাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ অনুমোদন করে এবং আপামর দেশবাসী বিভিন্ন গণমাধ্যমের মাধ্যমে সেই সম্পর্কে জানতে পারে। স্বভাবতই জাতীয় শিক্ষানীতি বর্তমানে একটি আলোচিত বিষয়। এই নিবন্ধের আলোচকও অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে কয়েকটি কথা ব্যক্ত করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। আমার আলোচনাটাকে তিনভাগে ভাগ করে উপস্থিত করবো। প্রথমভাগে প্রেক্ষাপট, দ্বিতীয়ভাগে শিক্ষানীতির কয়েকটি বিষয় আর তৃতীয়ভাগে শিক্ষানীতির প্রভাব আলোচনা করার চেষ্টা করবো। আলোচনার শুরুতে বলে রাখি যে , আলোচনা এখানে করা সম্ভব নয়। সংক্ষিপ্ত পরিসরে গুটিকয়েক কথা আপনাদের সামনে উপস্থিত করবো। একজন শিক্ষক তথা দেশের নাগরিক হিসাবে জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কে আলোচকের উপলব্ধি অন্যান্যদের সঙ্গে বিনিময় করা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য ।

প্রেক্ষাপট :-

আমরা সকলেই জানি যে, শিক্ষানীতি দেশের অন্যতম একটি মৌলিক নীতি বলে গণ্য হয়। শিক্ষানীতির মাধ্যমে শিক্ষার প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী, শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে জানতে পারা যায়। আমাদের দেশে এটি তৃতীয় জাতীয় শিক্ষানীতি। প্রথম শিক্ষানীতি ঘোষিত হয়েছিল ১৯৬৮ সালে, ১৯৮৬ সালে দ্বিতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হয় এবং ১৯৯২ সালে তার কিছুটা সংশোধন করে সংশোধিত শিক্ষানীতি প্রচলিত হয় এবং তৃতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ সালে ঘোষিত হল। সুতরাং, বলা যায় যে, এবারের শিক্ষানীতি ৩৪ বছর পরে ঘোষিত হল। একথা বলা হয়তো অন্যায় হবে না যে বহু বছর বাদে আমাদের দেশের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হল। ইতিমধ্যে দেশের আর্থ–সামাজিক–রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে ।

আমাদের দেশের শিক্ষানীতি আমাদের সামনে উপস্থিত হলো একটা অস্বাভাবিক সময়ে যার কথা এই নিবন্ধের সূচনাতে উল্লেখ করা হয়েছে। অতিমারীকালীন অবস্থায় দেশের সকল নাগরিক মনে হয় স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে বিচলিত বোধ করছেন, উদ্বেগ আর আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন এটা বলা হয়তো ভুল হবে না। অনেকের কথা না বলতে পারলেও আলোচক উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। স্বাভাবিকভাবেই এটা প্রত্যাশিত ছিল যে, সরকার এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নীতি ঘোষণা করবেন। এই পরিস্থিতির সাথে লড়াইয়ের জন্য বিভিন্ন পরিকাঠামো গড়ে তোলার বিষয়ে আমাদের সামনে কিছু ঘোষণা করবেন। আমাদের উদ্বেগ কমবে, মৃত্যুর মিছিলকে ঠেকানো যাবে। কিন্তু যা ভাবি তাই ঘটে না। এক্ষেত্রেও তাই ঘটল। অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের সামনে হাজির হল জাতীয় শিক্ষানীতি। জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণার সময়টা আলোচককে নাড়া দিই।

Society Language and Culture

প্রেক্ষাপট রূপে দ্বিতীয় যেটা ব্যক্ত করতে চাই সেটা হলো যে, এই শিক্ষানীতিটার বীজ অনেক আগে প্রোথিত হয়েছিল। অর্থাৎ, আমি যেটা উল্লেখ করতে চাইছি তা হলো এই শিক্ষানীতির বীজ লুকিয়ে আছে আজ থেকে ১৯ বছর আগের একটি রিপোর্টে। রিপোর্টটির নাম ছিল "Report on a Policy Framework for Reforms in Education "। এই রিপোর্টটি প্রস্তুত করেছিলেন রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেডের প্রধান মুকেশ আম্বানী ও আদিত্য বিড়লা প্রধান কুমারমঙ্গলম বিড়লা। এই রিপোর্টটি ২০০০ সালে এপ্রিলে জমা দেওয়া হয়। সেই সময়ে কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় এন. ডি. এ-র নেতৃত্বে অটলবিহারী বাজপেয়ী মহাশয় আসীন। এই রিপোর্টে যে বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছিল বর্তমান শিক্ষানীতিতে তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, এটা বলা হয়তো অযৌক্তিক হবে না। এই রিপোর্টটা যদি পাঠক পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন, বাজারের স্বার্থে শিক্ষা যাতে পরিচালিত হয় এই রিপোর্টের ছত্রে ছত্রে তার নিদান দেওয়া হয়েছিল। ২০১৪ সালে যখন লোকসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তখন ভারতীয় জনতা পার্টি নির্বাচনী ইস্তেহারে ঘোষণা করেছিল যে যদি ঐ দল রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে অর্থাৎ সরকার গঠন করে তাহলে তাদের সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করবে। সুতরাং, এটি ছিল নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। ভারতীয় জনতা পার্টি যখন সরকার গঠন করল তখন তৎকালীন মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীমতী স্মৃতি ইরানী প্রাক্তন ক্যাবিনেট সচিব টি. এস. আর সুব্রহ্মনিয়মের নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠন করেন। ওই কমিটি ২০১৬ সালে মে মাসে তার রিপোর্ট জমা দিলে তা প্রকাশিত হয়। সেই কমিটি দ্বারা প্রণীত খসড়া রিপোর্ট সম্পর্কে নানা বিতর্ক হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৭ সালের জুন মাসে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে ইসরোর প্রাক্তন প্রধান ডঃ কে. কস্তুরীরঙ্গনের নেতৃত্বে আট সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়। ঐ কমিটি ২০১৯ সালের ৩১ মে জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া প্রস্তুত করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জমা দেয়। ঐ খসড়া রিপোর্টটি ছিল বেশ বড়ো। মোট ৪৮৪ পাতার রিপোর্ট। রিপোর্টটি চারটি ভাগে বিভক্ত ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার সেই রিপোর্টটিকে ক্যাবিনেটের অনুমোদনের ভিত্তিতে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেন। গত ২৯ শে জুলাই ২০২০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ নামক যে দলিল প্রকাশিত হল তা ডঃ কে কস্তুরীরঙ্গনের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রণীত রিপোর্টের নির্যাস, এটা বলা হয়তো অন্যায় হবে না। কারণ, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ রূপে যে দলিল সর্বসমক্ষে এলো তা আকারে ছোটো। ৬৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত। প্রসঙ্গক্রমে, এখানে দু'টি বিষয় উল্লেখ করে প্রেক্ষাপট সংক্রান্ত আমার কথা শেষ করবো।

প্রথমটি হলো, এটা খেয়াল রাখতে হবে যে, এই নীতি আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় আইনসভায় অর্থাৎ সংসদে আলোচিত হলো না। তার অর্থ দাঁড়ায় যে, শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের দেশের নির্বাচিত আইনসভার সদস্যরা কোনো মতামতের (পক্ষে বা বিপক্ষে যাই হোক না কেন) সুযোগ পেলেন না।

দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দেশ। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো অনুসারে আমাদের দেশে দ্বৈত সরকার আছে, যথা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার। ক্ষমতাবন্টনের তালিকা অনুসারে শিক্ষা বর্তমানে যুগ্ম তালিকার অন্তর্গত। যদিও এটা ঠিক যে, শিক্ষা একসময় রাজ্য তালিকাভুক্ত ছিল। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আমলে ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষা যুগ্ম তালিকায় স্থান পায়। সেই থেকে শিক্ষা যুগ্মতালিকার অন্তর্গত ছিল। শিক্ষা তাঁর পূর্বে যখন রাজ্য তালিকাভুক্ত ছিল তখন শিক্ষার বিষয়ে রাজ্যের একক ক্ষমতা ছিল। কিন্তু ৪২তম সংশোধনের পর থেকে শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ে সমস্যা সৃষ্টি হতে থাকে।

Society Language and Culture

এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে, দেশে যখন অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা জারী ছিল সেই সময়ে অর্থাৎ ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষাকে রাজ্য তালিকার থেকে যুগ্মতালিকায় নিয়ে যাওয়া হয়। যুগ্মতালিকানুসারে, তা বর্তমানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় সরকারের বিবেচ্য বিষয়। অর্থাৎ, শিক্ষার বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই আইন প্রণয়ণের অধিকারী। কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ই আইন প্রয়োগ করলে কেন্দ্রের আইনটা কার্যকরী হয়। বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণার ক্ষেত্রে যতটুকু জেনেছি সেইসূত্রে এটা বলা যায় যে, রাজ্য সরকারগুলির সাথে আলোচনা ব্যতিরেকে এই শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হলো। এটা মনে হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাথে খাপ খায় না। এই প্রেক্ষাপটটা মনে রেখে জাতীয় শিক্ষানীতির কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। সব বিষয়ে আলোচনা করা যাবে না।

শিক্ষানীতির মূল কয়েকটি বিষয় :-

প্রথমেই যেটা উল্লেখ করতে চাই যে, এই দলিলটা কোনো সাংবিধানিক দলিল নয়। এটা কোনো আইনগত দলিলও নয়। এটিকে বলা যেতে পারে শিক্ষা সংক্রান্ত একটি দিশা। এখানে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও কাঠামোর রূপরেখা, যা ভবিষ্যতে বাস্তবায়িত হবে তা আলোচিত হয়েছে। এই নীতির ভিত্তিতে সরকার প্রয়োজনীয় নিয়ম কানুন, আইন প্রণয়ন করবে। এই শিক্ষানীতির একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো যে, আমাদের দেশে প্রচলিত যে শিক্ষাকাঠামো রয়েছে তার খোলনলচে পাল্টে দেবার কথা এখানে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, কাঠামোগত পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। আমাদের দেশে যে কাঠামোটি অনুসৃত হচ্ছিল তাকে সাধারণভাবে বলা যায় যে, আমরা ইউরোপীয়ান মডেল বা বিশেষত, ব্রিটিশ মডেল গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু এবারের শিক্ষানীতিতে তার পরিবর্তন ঘটিয়ে আমরা মার্কিন শিক্ষাকাঠামো প্রবর্তনে উদ্যত হয়েছি। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে , সর্বক্ষেত্রে মার্কিনী শিক্ষাব্যবস্থাকে অনুসৃত করা হয়েছে তা নয়, তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় যে বিষয়টি পাঠকদের গোচরে আনতে চাই তা হলো যে, এই শিক্ষানীতিতে প্রচলিত যে ব্যবস্থা রয়েছে তার কোথায়, পূর্বেকার শিক্ষানীতির ভাবনাগুলো রূপায়িত হয়েছে কিনা, যদি না হয় তা কেন হতে পারেনি সেগুলির কোনোরকম আলোচনা নেই। শিক্ষানীতির Introduction–এ Previous Policy এই সাবহেডিংয়ে মাত্র চারটি লাইন বরাদ্দ করা হয়েছে। কি বলা হয়েছে একটু দেখি। বলা হয়েছে, "The implementation of previous Policies on education has focused largely on issues of access and equity. The unfinished agenda of the National Policy on Education 1986 modified in 1992 (NPE 1986/92) is appropriately dealt with in this Policy. A major development since the last Policy of 1986/92 has been the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 which had down legal underpinnings for achieving universal elementary education." এইটুকু ছাড়া আর কোনো বিষয় উল্লেখিত নেই। যেটা বলা যায় তা হলো, পূর্বের শিক্ষানীতিগুলির কোনোরকম বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন ব্যতিরেকে নতুন শিক্ষানীতিতে শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তনের বিষয়টিকে নিয়ে আসা হলো।

Society Language and Culture

তৃতীয় যে বিষয়টি অবগত করতে চাই যে, এই ৬৬ পৃষ্ঠার দলিলে যা বর্ণিত হয়েছে তার অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষা সম্পর্কিত সদর্থক বা ইতিবাচক মনোভাবের পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। আবার এটাও হয়তো ভুল বলা হবে না যে, এই শিক্ষানীতিতে আমরা স্ববিরোধিতা দেখতে পাচ্ছি। অর্থাৎ, যখন শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণিত হচ্ছে তখন তাতে আমরা যে ইতিবাচক মনোভাব প্রত্যক্ষ করি সেই উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করার জন্য যে কার্যের (Action) উল্লেখ করা হচ্ছে সেখানে অসংগতি দেখা দিচ্ছে। উদাহরণ দিলে তা স্পষ্ট হবে। যেমন শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, চাকরীর বাজার সৃষ্টি করা শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। একশো শতাংশ ঠিক কথা। কিন্তু যখন উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যে কার্যপদ্ধতির, যে কাঠামো প্রবর্তনের কথা বলা হচ্ছে, যে ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হচ্ছে তা যদি একটু বিশ্লেষণাত্মক মনোভাব নিয়ে বিচার করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, বর্তমান ব্যবস্থায় একটা শিক্ষিত শ্রমিক যাতে গড়ে উঠতে পারে তার কথা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। পাঠকরা যদি নিজেরা দলিলটা ভালো করে পড়েন তা হলে আমার উল্লেখিত কথার সাদৃশ্য খুঁজে পাবেন। আরেকটি বিষয় উদাহরণ হিসাবে রাখছি। দলিলে Principles of the Policy এই সাবহেডিংয়ে যা বলা হয়েছে তার দিকে যদি দৃষ্টি দিই তাহলে দেখবো যে সেখানে বলা হয়েছে, "The Purpose of the education system is to develop good human beings capable of rational thought and action, Possessing Compassion and empathy, courage and resilience, scientific temper and creative imagination, with sound ethical moorings and values. It aims at equitable, inclusive and Plural Society as envisaged by our Constitution. "এই বক্তব্যের কেউ কি বিরোধিতা করবেন? নিশ্চয় না। আলোচকের বক্তব্য হচ্ছে দলিলে এই সুন্দর কথাগুলি লিখলে তো হবে না। এই কথাগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে। 'শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না' এটা আমরা সকলেই জানি। তাই বলা যায় যে, দলিলে লক্ষ্য হিসাবে সুন্দর কথা বলা হলেও কার্যক্ষেত্রে তার প্রতিফলন প্রতিভাত হচ্ছে না। এটাই স্ববিরোধিতা। একদিকে বিজ্ঞানমনস্কতার কথা বলা হচ্ছে আর অন্যদিকে যে মূল্যবোধের বা দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠতে পারে সেই বিষয়টি নীতিতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

এবারে শিক্ষানীতিতে বর্ণিত বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এক্ষেত্রে যেটা সর্বাগ্রে খেয়াল করা দরকার যে, এই শিক্ষানীতিতে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোর (বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা উভয়স্তরেই) আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। এই পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ এই নীতিতে পরিলক্ষিত হয় না। আমরা যদি বিদ্যালয়স্তরের শিক্ষাকাঠামোর দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো যে, বিদ্যালয়স্তরে ৫+৩+৩+৪ কাঠামো গড়ে তোলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রচলিত মাধ্যমিক ব্যবস্থা ও তার পরবর্তী উচ্চমাধ্যমিক স্তরের যে কাঠামো ছিল তাকে নতুন কাঠামোর দ্বারা পাল্টে ফেলার বিষয়টি শিক্ষানীতিতে উচ্চারিত হয়েছে।

Society Language and Culture

বিদ্যালয় শিক্ষার কাঠামোকে আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে এই শিক্ষানীতিতে। প্রচলিত ১০+২ যে কাঠামো ছিল তার পরিবর্তে ৫+৩+৩+৪ এই কাঠামোর কথা বলা হয়েছে। প্রথম পাঁচ বছর ভিত্তি স্তর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে তিন বছর বয়স্ক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরের তিন বছর তৃতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত, যা প্রাথমিক বা প্রাইমারী স্তর বলে চিহ্নিত হবে। তার পরের তিন বছর গণ্য হবে উচ্চ প্রাথমিক বা আপার প্রাইমারী স্তর রূপে এখানে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। আর শেষ চার বছর হবে মাধ্যমিক বা সেকেন্ডারী স্তর, এখানে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে বার্ষিক পরীক্ষা হবে না। সেমেস্টার পদ্ধতিতে পড়াশুনা হবে। আটটি সেমেস্টার। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বর্তমানে যে তিনটি শাখার বিভাজন প্রচলিত আছে তা সম্পূর্ণ বিলোপ করে দেওয়া হয়েছে এই নীতিতে। তার পরিবর্তে মাল্টিডিসিপ্লিনারী কোর্সের কথা বলা হয়েছে। একজন ছাত্র বা ছাত্রী তার পছন্দ অনুসারে যে কোনও বিষয় নিতে পারবে। তর্কের খাতিরে যদি মেনে নেওয়া হয় যে, শিক্ষার্থীদের স্বার্থে এটা ভালো ব্যবস্থা কিন্তু এক্ষেত্রে এই প্রশ্নটা করা অন্যায় হবে না যে, এই ভালো ব্যবস্থা রূপায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো কি আছে? শিক্ষার্থীদের দিক থেকে দেখলে এই প্রশ্ন তোলা বোধহয় অসংগত হবে না যে, নানা কোর্সের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের ফেলে দিয়ে তাদের কি বিভ্রান্ত করা হবে না? শিক্ষার্থীদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের বিকাশ কি সত্যিকারে সম্ভব হবে এই পদ্ধতির মাধ্যমে? এই নীতি কি প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অঙ্গন থেকে দূরে ঠেলে দেবে না তো?

এই নীতিতে স্কুল কমপ্লেক্স গঠনের কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, এই ধারণাটা নতুন নয়। কোঠারী কমিশনের শিক্ষানীতিতে স্কুল কমপ্লেক্স গঠনের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, কোঠারী কমিশন কর্তৃক ঘোষিত স্কুল কমপ্লেক্স গঠনের কথা বলা হয়েছে তা একদম ভিন্ন। এখানে স্কুল কমপ্লেক্সের বিষয়টি এসেছে স্কুলের সংখ্যা কমানোর ভিত্তিতে। যেখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমে যাবে সেখানে অন্য স্কুলের সঙ্গে তাকে মিশিয়ে দেওয়া হবে। ঐ স্কুলটি উঠে যাবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে যদি এইরকম ঘটনা ঘটে তাহলে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে দূরবর্তী স্থানে গিয়ে শিক্ষাগ্রহণ করা সম্ভব হবে না, এটাই বাস্তব। সুতরাং, শিক্ষা প্রসারণের পরিবর্তে এর মাধ্যমে শিক্ষা সংকুচিত হবে। আমরা যদি শিক্ষার প্রসারণের কথা চিন্তা করি, তাহলে এই স্কুল কমপ্লেক্স গঠনের বিষয়টিকে কি সমর্থন করতে পারি? পাঠক চিন্তা করবেন এই বিষয়টা।

এই শিক্ষানীতিতে উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিদ্যালয় স্তরে বোর্ডের পরীক্ষার ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ করতে পারবে, এটা প্রচলিত আছে। সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন করার কথা বলা হয়েছে শিক্ষানীতিতে। নীতিতে বলা হয়েছে যে, উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হবে এবং এই পরীক্ষা সর্বভারতীয় স্তরে সংঘটিত হবে। এই পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে National Testing Agency-এর হাতে। এই পরীক্ষাটি নেওয়া হবে অ্যাপটিচ্যুড-সহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর। এই পরীক্ষা ছাত্রছাত্রীদের উপর বিশেষ বোঝা সৃষ্টি করবে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

Society Language and Culture

বর্তমানে আমরা শহরের আনাচে-কানাচে ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যালে ভর্তি হবার জন্য বিভিন্ন কোচিং সেন্টার দেখতে পাই এবং উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা প্রচুর অর্থের বিনিময়ে সেই সেন্টারে ট্রেনিং নিয়ে থাকে। সবাই যে শেষ পর্যন্ত সুযোগ পায় তা অবশ্য নয়। সুতরাং, উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হলে গ্রাম, শহর সর্বত্র যে এই রকম ট্রেনিং সেন্টার গজিয়ে উঠবে, যা অবশ্যই ব্যয়সাপেক্ষ এটা হলফ করে বলা যায়। স্বভাবতই, এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ভবিষ্যতে সাধারণ গরীব পরিবারের ছাত্রছাত্রী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে এবং শিক্ষা তাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে, এটা বলা হয়তো ভুল হবে না।

উচ্চশিক্ষার স্তর :-

এই স্তরে মূলতঃ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে বলা হয়েছে। এখানেও আমরা দেখবো যে, প্রচলিত কাঠামোকে আমূল পাল্টে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আমরা যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো দেখতে অভ্যস্ত এই শিক্ষানীতিতে তা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করার কথা বলা হয়েছে। উচ্চশিক্ষাস্তরে তিন ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

সেগুলি হল যথাক্রমে –

১) গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় (রিসার্চ ইউনিভার্সিটি)ঃ- এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ হবে গবেষণা ।

২) শিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় (টিচিং, ইউনিভার্সিটি) ঃ- এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের সঙ্গে গবেষণাও হবে।

৩) স্বশাসিত ডিগ্রী কলেজ ঃ এই কলেজগুলি ডিগ্রী প্রদানের অধিকারী হবে এবং পূর্বের মতো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকবে না।

এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত পরিবর্তন, এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

দ্বিতীয় যে বদলটা আমরা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি সেটা হল প্রচলিত তিন বছরের স্নাতক পাঠক্রমের পরিবর্তে চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম চালু করার কথা বলা হয়েছে। এটাতে তেমন আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু যে বদলটা এল তা কেবল পাঠক্রম এক বছর বৃদ্ধি করা নয়, এই নতুন পাঠক্রমে নমনীয় ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এখানে প্রতি বছর পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ও প্রস্থানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। একজন ছাত্রছাত্রী চার বছরের কোর্সে ভর্তি হল, কিন্তু সে এক বছর বাদে ছেড়ে দিল পড়াশুনা। পূর্বের নিয়মানুসারে, সে এক্ষেত্রে কোনো ডিগ্রী পাবে না। কিন্তু নতুন নিয়মে বলা হল, এক বছরের শেষে সে পড়াশুনা ছাড়লে পাবে সার্টিফিকেট, দ্বিতীয় বছরে ডিপ্লোমা, তৃতীয় বছরে ডিগ্রী আর চার বছর সম্পূর্ণ করলে সেই ছাত্র বা ছাত্রী অনার্স ডিগ্রী লাভ করবে।

Society Language and Culture

স্নাতকোত্তর স্তরেও বদল আনা হচ্ছে। প্রচলিত ব্যবস্থায় দুই বছরের স্নাতকোত্তর কোর্স আমরা দেখতে পাই, তা পরিবর্তন করে বলা হচ্ছে যে, চার বছরে যে ছাত্রছাত্রী অনার্স নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়া শেষ করবে তাকে এক বছরের মাষ্টার্স পড়তে হবে। আর তিন বছরের শেষে যে ডিগ্রী লাভ করবে সে দু'বছরের মাস্টার্স কোর্স পড়বে। প্রচলিত বি এড কোর্সেও পরিবর্তনের ইঙ্গিত রয়েছে এই শিক্ষানীতিতে। প্রচলিত ব্যবস্থায় বি. এডের জন্য রয়েছে আলাদা ব্যবস্থা। কিন্তু শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে যে, আলাদা বি.এড কলেজের দরকার নেই। সাধারণ কলেজেই বি.এড পড়ানো হবে। প্রশ্ন হলো, সাধারণ কলেজে সেই পরিকাঠামো আছে? যে বি এড কলেজগুলো আছে তার কি হবে? এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর শিক্ষানীতিতে নেই।

তৃতীয়ত, স্নাতকস্তরে মাল্টিডিসিপ্লিনারি কোর্স ও চয়েস বেসড ক্রেডিট সিস্টেমের কথা বলা আছে। অর্থাৎ, ছাত্রছাত্রীরা তাদের পছন্দমতো বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করতে পারবে। কোনো নির্দিষ্ট ধাঁচে তাকে পড়াশুনা করতে বাধ্য করা যাবে না। নতুন শিক্ষানীতিতে উচ্চশিক্ষাস্তরে যে কাঠামো বদলের কথা বলা হয়েছে তা কি ভবিষ্যতে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার অঙ্গন থেকে দূরে সরিয়ে দেবে না তো? এই রকম প্রশ্ন মনে উঁকি মারা অস্বাভাবিক নর। বিশদ ব্যাখার মধ্যে না গিয়ে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এটা বলা যায় যে, শিক্ষানীতিতে সুন্দর ও সদর্থক কথা উচ্চারিত হলেও বাস্তবে তা রূপায়িত করা যায় না। বিষয়গুলি অধরা থেকে যায়। একটা উদাহরণ দিয়ে বললে তা স্পষ্ট হবে। স্নাতকস্তরে মাল্টিডিসিপ্লিনারি কোর্স ও চয়েস বেসড সিস্টেমের কথা বলা আছে। শুনতে খুব ভালো। গালভারী শব্দ। বাস্তব অভিজ্ঞতা কি? কোনও ছাত্রছাত্রী কোনও কলেজে পদার্থবিদ্যার সঙ্গে সংস্কৃত বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়তে চাইলে তাকে কি সেই সুযোগ দেওয়া হয় বা হবে? এককথায় উত্ত, না। তার কারণ সেই পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়নি। সুতরাং, আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে, আমরা নতুন যে কাঠামো গড়ে তুলতে চাইছি তার প্রয়োজনীয় সকল রকম পরিকাঠামো গড়ে তোলার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে কি না। যদি সেই পরিকাঠামো না গড়ে ওঠে তাহলে তা সঠিক অর্থে বাস্তবায়িত হতে পারে না। স্নাতকস্তরে প্রতি বছর যে প্রবেশ ও প্রস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে, এতে ভালোই হবে। কিন্তু ভেবে দেখুন তো এক বছর শেষে সার্টিফিকেট পেয়ে তার সামনে চাকরীর কোনও দরজা খোলা থাকবে? বিপরীতপক্ষে, এই নীতির মাধ্যমে কি শিক্ষিত শ্রমিক তৈরী করার বিষয়টি প্রাধান্য পাচ্ছে না? পাঠক ভেবে দেখবেন।

আমরা দেখবো যে, এই শিক্ষানীতিতে অনলাইন শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। বিদ্যালয় স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে অনলাইন শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে আলোচক প্রযুক্তির বিরোধী নয়। উন্নত প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে হবে নিশ্চয়। কিন্তু কিভাবে ও কোন ক্ষেত্রে কেমনভাবে তা ব্যবহার করা যেতে পারে তা নিশ্চয় ভাবতে হবে। প্রচলিত যে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে আমরা অভ্যস্ত তাকে সাধারণভাবে আমরা 'Chalk and talk' পদ্ধতি বলে থাকি। এই পদ্ধতির মাধ্যমে যখন শিক্ষাদান করা হয় তখন তার মাধ্যমে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর মধ্যে একটি সম্পর্কের বন্ধনও গড়ে ওঠে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে

Society Language and Culture

পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে ছাত্র, শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটা ত্রিমুখী সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এটা হয়তো অস্বীকার করা যাবে না যে, একজন শিক্ষক ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে তার মধ্যে ধারণা বা অন্তর্দৃষ্টির জন্ম দেন এবং পাঠদান আর শিক্ষণ হচ্ছে একটা দক্ষতাবিশে, যা সর্বদা তৈরী হয় এবং তা শ্রেণীকক্ষের পাঠদানের মাধ্যমে সম্ভব হয়। এটা কিন্তু অনলাইন শিক্ষায় সম্ভব হয় না। এছাড়া, বাস্তব প্রেক্ষিতের ভিত্তিতে বিচার করে দেখলে কখনই কি বলা যাবে যে, অনলাইন শিক্ষার সুযোগ সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে? আমাদের দেশে এই অনলাইনে শিক্ষার সুযোগ নেওয়ার পরিকাঠামো কি সবার আছে? এই পদ্ধতিতে শিক্ষার জন্য দরকার পড়বে কম্পিউটার বা ল্যাপটপ বা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন, লাগবে ইন্টারনেট সংযোগ ইত্যাদি। একঝলকে দেখে নিই আমাদের দেশের অবস্থা কি? গত ৮ ই সেপ্টেম্বর, ২০২০ আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি খবর প্রকাশিত হয়, খবরটির হেডলাইন ছিল - "অক্ষরজ্ঞান বেড়েছে, প্রশ্নে অনলাইন পাঠ"। এই খবরটিতে বলা হয়েছিল, জাতীয় নমুনা সমীক্ষা অনুযায়ী দেশের মাত্র ১০.৭% পরিবারের কম্পিউটার রয়েছে। ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে মাত্র ২৩.৮% পরিবারের। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ৯.৪% পরিবারের কম্পিউটার রয়েছে। মাত্র ১৬.৫% পরিবারের রয়েছে ইন্টারনেটের সুবিধা। এইরকম দুর্বল পরিকাঠামো দিয়ে অনলাইনে শিক্ষা সম্ভব? ডিজিটাল লার্নিং কথাটা শুনতে ভালো, কিন্তু ডিজিটাল লার্নিং কি শিক্ষায় এক ব্যাপক বিভাজন তৈরী করবে না? এটা কি আমরা ভাবছি? সবিনয়ে পাঠকবৃন্দকে বলতে চাই যে, উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সুবিধাভোগী আর্থিক স্বচ্ছল পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা অনলাইনের যে সুযোগ লাভ করতে পারে, প্রান্তিক পরিবারের ছাত্রছাত্রী যারা শহর থেকে দূরে বাস করে, তাদের পক্ষে কি অনলাইনের সুবিধা নেওয়া সম্ভব হবে? অনলাইনে শিক্ষার খরচটা আমরা আলোচনায় আনি না। অনেক শিক্ষক শিক্ষিকাও অনলাইনে শিক্ষার ব্যাপারটা খুব সোৎসাহে নানা মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকেন তাদের বিনীতভাবে বলবো যে, এর সুবিধা সবার কাছে সমানভাবে পৌঁছোচ্ছে কি? আলোচক মনে করে যে, অনলাইন শিক্ষা কখনও ক্লাসরুম শিক্ষার বিকল্প হতে পারে না, বরং তা পরিপূরক হতে পারে। তাই মনে হয় যে, অনলাইন শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করার মাধ্যমে এক বৃহৎ অংশের ছাত্রছাত্রী শিক্ষার অঙ্গন থেকে সরে যেতে বাধ্য হবে।

এবার আসি শিক্ষাখাতে ব্যয়ের প্রসঙ্গে। এই আলোচনায় পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, শিক্ষানীতিতে শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভীষণ সুন্দর কথা বলা হয়েছ। কিন্তু প্রশ্নটা অন্যখানে। ৪৮৪ পাতা হোক বা ৬৬ পাতা হোক, সুন্দর কথা লিখলেই তো তা আপনাআপনি রূপায়িত হবে না। এই সুবচনগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে। আর তার জন্য দরকার পড়বে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর। পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাখাতে প্রয়োজনীয় ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি করার দরকার। কিন্তু এটা বলা হয়তো অন্যায় হবে না যে, শিক্ষানীতিতে উল্লেখিত শিক্ষায় ব্যয়ের বিষয়টি আলোচককে হতাশ করে তোলে। শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে যে, ডিজিপির ছ'শতাংশ শিক্ষাখাতে হবে। সবিনয়ে বলতে চাই, কেউ ধৃষ্টতা মনে করবেন না । শিক্ষাখাতে জি.ডি .পি.র ছ'শতাংশ ব্যয়ের বিষয়টি কোঠারী কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষানীতি ও তার পরবর্তী শিক্ষানীতিতেও বলা হয়েছিল। কিন্তু তা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। এক্ষেত্রে প্রসঙ্গক্রমে বলি যে, খসড়া রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে,

Society Language and Culture

সরকারের মোট ব্যয়ের ২০% শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হবে। কিন্তু জাতীয় শিক্ষানীতির দলিলে তা অনুপস্থিত। প্রসঙ্গক্রমে এটাও উল্লেখ্য য, আমাদের দেশের শিক্ষায় বর্তমানে জি. ডি. পি. র মাত্র ৪.৪% ব্যয় হয়ণ। কিন্তু বলিভিয়া, ব্রাজিল বুরান্ত, কোস্তারিকা, হন্ডুরাস ও জামাইকা শিক্ষাখাতে জাতীয় আয়ের যথাক্রমে ৬.৪%, ৬.৩%, ৫.৪%, ৬.০৯%, ৫.৯% এবং ৬.৩% ব্যয় করে (এই তথ্যটি দেশ পত্রিকার ২ সেপ্টেম্বর ২০২০ সংখ্যায় অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস মহাশয়ের নব্য – ভাবধারার প্রতীক হয়ে উঠতে পারবে কি এই লেখা থেকে পাওয়া)। আরেকটি কথাও উল্লেখ করতে চাই। কোভিড পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনীতির যে চিত্র সরকারী ভাষ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে সামগ্রিক জি .ডি. পি. র. অধোগতি অবস্থা সেক্ষেত্রে সেই জি .ডি. পি. র. ছ'শতাংশের মাধ্যমে শিক্ষানীতিতে বর্ণিত সুবচনগুলি বাস্তবায়িত করা কি সম্ভব হবে? সুবচনগুলি কি অধরাই থেকে যাবে না? আমাদের বোধহয় এটা ভাবতে হবে।

অনেক বিষয় আলোচনার দরকার থাকলেও আর আলোচনা বাড়াবো না। আলোচনার শেষভাগে জাতীয় শিক্ষানীতি এই আলোচকের কাছে যেমনভাবে বোধগম্য হয়েছে সেই সম্পর্কে দু'-চারটি কথা উল্লেখ করবো। আলোচকের মতের সঙ্গে পাঠকের মতের মিল নাও হতে পারে। সংক্ষিপ্তভাবে জাতীয় শিক্ষানীতির সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে কয়েকটি কথা নিবেদন করার চেষ্টা করবো।

প্রথমত, শিক্ষানীতি ২০২০ শিক্ষায় ব্যাপক ছাত্রছাত্রীর অন্তর্ভুক্তিকরণের পরিবর্তে শিক্ষার প্রতিটি স্তরে ছুটের সংখ্যা (Dropout) বৃদ্ধি করবে বলে মনে হয়, কারণ দলিলে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে যতই সদর্থক সুবচন ব্যক্ত হোক না কেন, প্রায়োগিক ক্ষেত্রে দলিলের মাধ্যমে যে নির্দেশিকা উপস্থিত হয়েছে তাতে মনে হয় আগামী দিনে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য, বিভাজন তৈরী হবে। 'সবার জন্য শিক্ষা' বাস্তবায়িত হবে না এই পথে।

দ্বিতীয়ত, এই শিক্ষানীতির একটি বড় তাৎপর্য বোধ হয় এটা যে, সাধারণভাবে এটি পাঠ করলে মনে হবে যে, এটার মধ্যে কোনও রাজনীতি নেই। সরকার সত্যিকারে শিক্ষার লক্ষ্যে এই নীতি প্রণয়ন করেছে। আপাত অর্থে কথাটা ঠিকও। কিন্তু এই নিবন্ধের আলোচক মনে করেন যে, এই নীতির মধ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে রাজনীতি রয়েছে। আলোচক এটা মনে করে যে, সরকার পরিচালনা করে রাজনৈতিক দল। ফলে রাজনৈতিক দল যদি মতাদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় তাহলে সরকারের কর্মসূচী প্রণয়নে ও রূপায়নে তার প্রতিফলন থাকবে, এটা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। এছাড়া আমরা জানি যে, অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর শিক্ষা নামক পরিকাঠামো গড়ে ওঠে। সুতরাং, বাজারভিত্তিক নয়া উদারনীতিবাদ অর্থনীতি যে দেশ বা সরকার পরিচালনা করে তার শিক্ষানীতি সেই অর্থনীতির পরিপূরক হবে। তার অন্যথা হতে পারে না। আর তার জন্য শিক্ষানীতিতে সুপষ্টভাবে রাজনৈতিক শব্দের ব্যবহার প্রয়োজন হয় না। বরং যদি শিক্ষানীতিতে আপাতভাবে প্রচলিত রাজনৈতিক শব্দ মতাদর্শবহনকারী ধারণাগুলি ব্যবহৃত না হয়, তাহলে তা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে। সেই কাজটাই ৬৬ পৃষ্ঠার দলিলে করা হয়েছে। আপাতঅর্থে মহৎ উদ্দেশ্য

Society Language and Culture

লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু রাজনৈতিক লক্ষ্যটা সূক্ষ্মভাবে নিহিত রয়েছে। পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন তা কিভাবে হতে পারে? আমি এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। শিক্ষানীতির বিভিন্ন জায়গায় প্রাচীন ভারতীয় চিন্তা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। উচ্চারিত হয়েছে নালন্দা, তক্ষশীলা, বিক্রমশীলা প্রমুখ প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের নাম। কোনো আপত্তি নেই। এ সবই আমাদের ঐতিহ্য। কিন্তু আপনি কি মনে করেন যে, মধ্যযুগে আমাদের কোনো ঐতিহ্য নেই? নবজাগরণে আমাদের যে জ্ঞানচর্চা তার কোনো মূল্য নেই? এই শিক্ষানীতির কোথাও কিন্তু এগুলির উল্লেখ নেই। এটা কি রাজনীতি নয়? ভাবতে হবে পাঠককে।

তৃতীয়ত, যেটা উল্লেখ করতে চাই পাঠকের চিন্তার জন্য তা হলো যে, এই শিক্ষানীতিতে কয়েকটি শব্দ বারবার উচ্চারিত হয়েছে। আবার আশ্চর্যভাবে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কথা একদম অনুপস্থিত রয়েছে শিক্ষানীতির আলোচনায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, উচ্চশিক্ষার আলোচনায় কোনওক্ষেত্রে অধিকার (Right) শব্দের উল্লেখ নেই।

চতুর্থত, শিক্ষানীতির কোথাও পিছিয়ে পড়া দুর্বলতম অংশের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রচলিত যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা রয়েছে তার উল্লেখ নেই। Socio-economic Disadvantage group সম্পর্কিত আলোচনা আছে। কিন্তু তাদের সংরক্ষণ ছাড়া কি শিক্ষাঙ্গণে আনা সম্ভব হবে কিভাবে? কোনও সদুত্তর নেই। প্রসঙ্গত, শিক্ষানীতিতে তপশিলী জাতি, উপজাতি বা ওবিসি শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়নি। Socio-economic disadvantage group কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে। এরা কারা সেটা স্পষ্ট করে বলা হয়নি।

পঞ্চমত, এই শিক্ষানীতিতে নানা ধরণের সংস্থা গঠনের কথা বলা হয়েছে। যথাঃ- Higher Education Commission of India (HECI), National Research Foundation (NRF), National Testing Agency (NTA), National Assessment Centre – PARAKH, National Educational Technology Forum (NETF), Professional Standard Setting Body (PSSB), National Professional Standards For Teachers (NPST) ইত্যাদি। এই সকল সংস্থাগঠনের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীকরণের ছাপ স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্যের হস্তক্ষেপের অধিকার কার্যত কিছু থাকবে না, এটা বলা হয়তো ভুল হবে না। এটা মনে হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় একটা বড় অসংগতি।

ষষ্ঠত, এই শিক্ষানীতিতে শিক্ষাকে প্রত্যক্ষভাবে বেসরকারি ব্যক্তি পুঁজির হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়নি এটা হয়তো ঠিক। কিন্তু ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায় -- এই প্রবচনটা যেন মনে চলে আসে যখন দেখি যে, শিক্ষাক্ষেত্রে জনহিতকর সংস্থার (Philanthropic) ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। সাধারণভাবে আমরা পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কথা শুনতে অভ্যস্ত। পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপে গঠিত প্রতিষ্ঠানও আমরা দেখতে পাই। ২০২০ শিক্ষানীতিতে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কথাটা বলা হয়নি। জনহিতকর সংস্থার নাম করে কর্পোরেট পুঁজি শিক্ষার বাজারকে ভবিষ্যতে কি গ্রাস করবে? এইরকম আশঙ্কা হয়। আশংকার কারণ এইজন্য যে, যখন দেখি এই সকল জনহিতকর সংস্থার ক্ষেত্রে সরকারী নিয়মের কিছু ছাড়

Society Language and Culture

দেওয়ার কথাও উচ্চারিত হয়েছে। আবার বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়কে আমাদের দেশে ক্যাম্পাস খোলার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে এই শিক্ষানীতিতে তাও বলা হয়েছে। এই সব উদ্যোগ কি শিক্ষাকে বাজারের হাতে অর্পণ করার এক সররকারী প্রচেষ্টা? পাঠকদের একটু ভেবে দেখতে বলবো। যদি এই আশঙ্কা সত্য না হয় তাহলে নিশ্চয় তা মঙ্গলদায়ক হবে দেশের পক্ষে। কিন্তু শিক্ষানীতিতে যা ঘোষিত হয়েছে তার মধ্যে যেন সর্বজনীন শিক্ষার পথে যা প্রতিবন্ধক সেগুলিই প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলা হচ্ছে।

সপ্তমত, এই শিক্ষানীতিতে যে সকল কাঠামো গঠনের কথা উল্লেখিত হয়েছে তা যে কেন্দ্রীকরণের ঝোঁককে প্রতিফলিত করে, এটা বলা হয়তো ভুল হবে না। এটাও উল্লেখ করা অন্যায় হবে না যে, এই শিক্ষানীতির মাধ্যমে আমাদের দেশের বৈচিত্র্য , বহুত্ববাদী সংস্কৃতিকে অস্বীকার করে কেন্দ্রীভূত, একমাত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। বিশদে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হলো না। কিন্তু এই শিক্ষানীতি শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য প্রকট করে তুলবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পরিশেষে বলি, ভারতের শিক্ষা বাজার একটি বৃহৎ বাজার। আমাদের দেশে প্রায় ২৫ কোটি ছাত্রছাত্রী শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই বাজারের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হলে তা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে পারে না, এই কথাটা বলা মনে হয় অন্যায় হবে না। সবার জন্য শিক্ষা, যা দীর্ঘদিনের চাহিদা, তা অধরা দেখে যাবে। শিক্ষানীতির ভূমিকায় শিক্ষার মহৎ উদ্দেশ্য বিবৃত হলেও বাস্তবে এই নীতি শেষপর্যন্ত শিক্ষার দরজাকে সকলের জন্য উন্মুক্ত না করে শিক্ষাকে ক্রয় করার ক্ষমতার ভিত্তিতে বাজারের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, এটা মনে হওয়াটা কোনো দোষের হবে না।

ঋণস্বীকারঃ- *এই লেখাটার জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ দলিলটি যা Website থেকে পেয়েছি তার সাহায্য নিয়েছি। এছাড়া, এই শিক্ষানীতি সম্পর্কিত লেখা যা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বা সোশ্যাল মিডিয়াতে আলোচিত হয়েছে, সেই সবের সাহায্য নিয়েছি। আমি এই সকল কিছুর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।*

Society Language and Culture